দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/AZ24005

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

(Human Role in Environmental Conservation and Climate Change: A Philosophical Analysis)

অরিনা খাতুন জিনিয়া*

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। এই সংকট কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নয়, বরং এটি একটি গভীর নৈতিক ও দার্শনিক সংকটও বটে। এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কীভাবে মানুষের জীবনবোধ নৈতিকতা ও অস্তিত্ব পরিবেশ-সংরক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রসঙ্গে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব বিশ্লেষণ করা ও এর অন্যতম লক্ষ্য। আধুনিক শিল্পায়ন, ভোগবাদ ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠে: মানুষ কীভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধ? দার্শনিক ব্যাখ্যায় দেখা যায়, পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র ব্যবহারিক বা অর্থনৈতিক নয়, বরং এটি একটি নৈতিক প্রশ্ন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকার নৈতিক ভিত্তি অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও প্রকৃতির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পৃথিবী নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাওয়া জরুরি। আইন, নীতি ও প্রযুক্তির পাশাপাশি চাই মনোভাবের পরিবর্তন– যা মানুষকে ভোগের মনোভাব থেকে সহাবস্থানের নীতিতে ফিরিয়ে আনবে।

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইলঃ arina@du.ac.bd

Abstract

In the current world, the environmental crisis and climate change have become a global challenge. This crisises are not only scientific and technological, but also deep moral and philosophical crisis. This article analyzes how human life, morality and existence are closely related to environmental protection. To analyze human moral responsibility in the context of environmental protection and climate change is one of its goals. Modern industrialization, consumerism and technology-dependent lives are causing environmental disasters, and climate change has become a global crisis. In this context, the question arises: how and to what extent are humans responsible for nature? In the philosophical interpretation, it can be seen that human responsibility for the environment is not only practical or economic, but also a moral question. In the global context, it is very important to explore the moral basis of human role in preserving the natural environment and our responsibility to future generations. There is no alternative to implement moral ideals in ensuring a safe and sustainable world for future generations by establishing a balanced relationship between human beings and non-humans natural entities. This article states that it is important to give priority to a moral perspective in environmental protection. Along with laws, policies, and technologies we need to change our attitude – natural antities that will bring people back from a consumerist mindset to a principle of coexistence.

ভূমিকা

দর্শনের একটি শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য এবং মানব আচরণের মুল্যবোধ আলোচনা করে। নীতিবিদ্যা মূলত একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। নীতিবিদ্যাকে সাধারণত আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা, পরানীতিবিদ্যা, বর্ণনাত্মক নীতিবিদ্যা নামক তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এছাড়া প্রয়োগিক নীতিবিদ্যা নামক নীতিবিদ্যার আরেকটি ভাগ আছে এবং পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার অর্ন্তগত। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতি সাথে মানুষের সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্র উল্লেখ রয়েছে। দর্শনের একটি শাখা হিসেবে পরিবেশ নীতি বিদ্যা মানুষের সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাণীর অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

প্রাকৃতিক জগৎ এবং মানুষের মধ্যকার নৈতিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পরিবেশ নীতি বিদ্যা আলোচনা করে থাকে। এই সম্পর্ক গুলো নিয়ন্ত্রণকারী নৈতিক নীতি

সমূহ পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী ও গাছপালা সম্পর্কিত আমাদের কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্বগুলো নির্ধারণ করে (Taylor, 2011, p. 03)।

অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের নৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিদ্যাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা, যা কিনা নৈতিক নিয়মসমূহের আলোকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সদস্য হিসেবে মানুষ, উদ্ভিদ, ও অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি নৈতিক নিয়মসমূহের প্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ নির্দেশ করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমি আলোচনা করব পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক। সময় এবং যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু এই বিষয়গুলোর আলোচনা এবং পরিধি ব্যাপকতা লাভ করেছে। পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে মূলত এক ধরনের আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান যার কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে মানুষ।

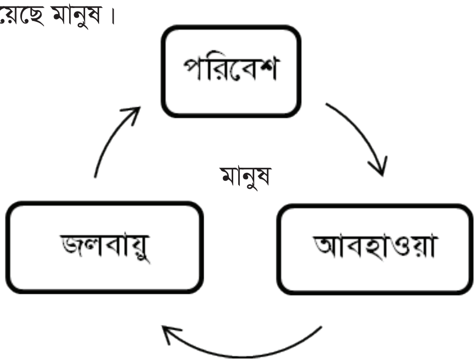

চিত্র-০১ : পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর কেন্দ্রবিন্দু মানুষ

আবহাওয়া ও জলবায়ু মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তাই পরিবেশের প্রতি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট থেকে প্রবন্ধের বিষয়টি নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এখানে পরিবেশের প্রতি মানুষের কেমন আচরণ করা উচিত, কোন ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত, পরিবেশের প্রতি মানুষের কোন আচরণ কেমন প্রভাব ফেলবে তা বিভিন্ন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তুলে ধরা ও পর্যালোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। সার্বিকভাবে এই প্রবন্ধে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো বিভিন্ন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণ পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কর্মের দায়বদ্ধতা বিশ্লেষণ, পরিবেশ ন্যায়পরতা সংক্রান্ত আলোচনা, পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক আলোচনাপূর্বক উল্লিখিত বিষয় সমূহের সাথে প্রাসঙ্গিক

তথ্যের উপস্থাপনের ভিত্তিতে পরিবেশের প্রতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপের গুরুত্ব।

এই মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধটি মূলত বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে যার প্রাথমিক উৎস হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রসঙ্গ

নীতিবিদ্যার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেয়র মধ্যে অন্যতম হলো ইচ্ছার স্বাধীনতা যা নৈতিক স্বীকার্য সত্য হিসেবে বিবেচিত। কোনো ব্যক্তির কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতার মাত্রা বিবেচনা করতে হবে। কোনো কাজের ক্ষেত্রে কাউকে দায়ী করার জন্য প্রথমে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা হলো কাজটি কর্তার দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত হয়েছে কি না, কাজের ফলাফল জানা সত্ত্বেও কর্তা কাজটি করেছে কি না অথবা কর্তার মাধ্যমেই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে কিনা?- উল্লিখিত বিষয়গুলোর পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি কাজের দায়িত্ব কোনো ব্যক্তির উপর আরোপ করতে পারি। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষের ভূমিকার নৈতিক ভিত্তির বিষয়টিও ঠিক তেমনি। এক্ষেত্রে বিষয়টির জন্য দায়ী কর্তা (agent) এবং কর্তার ইচ্ছার স্বাধীনতার মাত্রা ও পরিধির বিবেচ্য বিষয়।

ইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যতীত নৈতিক দায়িত্ব আরোপ সম্ভব নয়

কাজের নৈতিক দায়িত্ব আরোপের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষের ইচ্ছা যদি পরিবেশের অধীন হয় তা হলে মানুষের উপর কোনো কাজের নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করা চলে না। "মানুষ ইচ্ছার ক্ষেত্রে স্বাধীন বলেই তার কাজের নীতিগত বিচার বিবেচনা সম্ভব" [করিম, ২০০৬, পৃ. ১৭৭]। সাধারণত ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে বিভিন্ন বিকল্প কাজের মধ্যে একটিকে পছন্দ করে তা সম্পাদন করার সার্মথ্য বা ক্ষমতাকে বোঝায়। 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' ধারণাটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো : ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির একখণ্ড জমি আছে, যা বিভিন্ন ধরনের ফলজ ও বনজ গাছে পরিপূর্ণ। ব্যক্তিটি ঐ গাছগুলো কেটে ফেলবেন নাকি কাটবেন না এটি তার ইচ্ছার স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল।

কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে তথা দায়িত্ব আরোপের ক্ষেত্রের (পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) বিষয়টি পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে বিষয়টি নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

i. ব্যক্তি নিজের ভোগ বিলাসের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। যেমন : নিজের প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে বৃক্ষ নিধন করে, ফসলি জমি উজাড় করে, লোকালয়ে ইটের ভাটা স্থাপন করে অথবা পাহাড় ধ্বংস করে;

ii. কর্তা (agent) কাজটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কাজের ফলাফল জানা সত্ত্বেও কাজটি করেছে কি না অথবা কর্তার (agent) মাধ্যমেই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে কি না। এ দিকটি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত করে বলা যায় যে, পরিবেশ দূষণের তথা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের সহায়ক কাজগুলো যদি মানুষ করে থাকে তবে সেই কাজের জন্য কর্তা (agent) কে দায়ী করা যাবে। অনেক সময় দেখা যায় পরিবেশ দূষণ তথা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবতনের সহায়ক কাজগুলো মানুষ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় বৃক্ষনিধন, পাহাড়নিধন, নদীভরাট প্রভৃতি কাজগুলো পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর যেসব বিরূপ প্রভাব ফেলবে তা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও মানুষ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাববিস্তারকারী এ সমস্ত কাজ অবাধে করেই যাচ্ছে।

আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহায়ক কাজগুলো সংঘটনের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা প্রদান না করায় মানুষকে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভূমিকার জন্য নৈতিকভাবে দায়ী করা চলে। এ বিষয়ে Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর প্রতিবেদনের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। যেটিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। IPCC সায়েন্টিফিক অ্যাসেসমেন্ট নামে প্রতি পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময়ের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত অবস্থার বিবরণ প্রকাশ করে। প্রথম মূল্যায়ন রির্পোট (FAR, ১৯৯০) দ্বিতীয় মূল্যায়ন রিপোর্ট ১৯৯৬ সালে (SAR), ২০০১ সালে (TAR) এবং ২০০৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টটি AR4 নামে পরিচিত যা চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট হিসেবেও সুপরিচিত। ১ম প্রতিবেদন (FAR, ১৯৯০) জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের স্পষ্ট প্রভাব সীমিত থাকলে ও ২য় প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যা ৩য় প্রতিবেদনে গ্রীনহাউস গ্যাস বৃদ্ধিকে উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক প্রমানের ভিত্তিতে মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে *The Climate Crisis : An Introductory Guide to Climate Change* গ্রন্থে Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর প্রতিবেদন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> আইপিসিসি ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে (FAR) জলবায়ুর উপর সনাক্তযোগ্য মানব প্রভাবের পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ রয়েছে। ছয় বছর পর, আইপিসিসি সেকেন্ডে অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (SAR) উপসংহারে পৌঁছায় যে, প্রমাণের ভারসাম্য বিংশ শতাব্দীর জলাবায়ুর উপর একটি সুস্পষ্ট মানবিক প্রভাবের পরামর্শ দিয়েছে। তৃতীয় প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে : "গত ৫০ বছরে পর্যবেক্ষণ করা বেশিরভাগ উষ্ণতা গ্রিনহাউস

গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির কারণে হতে পারে” [Archer and Rahmstorf, 2012, p. 62]।

IPCC রিপোর্টে উল্লিখিত বিবর্তন শুধুমাত্রা বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন নয় বরং এটি জ্ঞানতত্ত্ব, নৈতিকতা, কারণ নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষের অবস্থানের পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। IPCC এর রিপোর্টের বিবর্তন মানব-সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধির ক্রমবর্ধমান গভীরতা এবং নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটায়। IPCC এর চারটি রিপোর্ট আমাদের দেখায় কিভাবে মানব জ্ঞান সময়ের সাথে ধাপে ধাপে উন্নত হয়। প্রথম রিপোর্টে মানুষ ও জলবায়ুর সম্পর্ক নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ রির্পোটে “suggested”, “likely” এবং “very likely” শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বিজ্ঞান কোনো সময় পূর্ণ নিশ্চয়তা দাবি করে না; বরং সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে করে সিদ্ধান্ত দেয়। রিপোর্টগুলোর মূল বিষয় হলো– মানুষ কি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ কিনা তা অনুসন্ধান করা।

কোনো স্থানের আবহাওয়া দীর্ঘদিনের গড় অবস্থার যেসব বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হতো তার অনুপস্থিতি বা পরিবর্তনই জলবায়ু পরিবর্তন। গতি এবং পরিবর্তন জগতের নিয়ম হলেও এই পরিবর্তনে ধারাবাহিকতা না থাকলে তা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে। জলবায়ুর ক্ষেত্রে পরিবর্তন এরূপ বিপর্যয় বয়ে আনছে যার ফলস্বরূরূপ আমরা প্রতিনিয়ত নানাধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছি।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন

পরিবেশের সাথে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত। ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তার পরিবেশ। কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের অর্থাৎ ১ থেকে ৭ দিনের বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আর কোনো স্থানের ৩০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রিনহাউস এফেক্ট। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পরিবেশের উপাদানগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার এর জন্য দায়ী। অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যকার ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়াকে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সে প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তন বোধে পরিবেশ সংরক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

জলবায়ু পরিবর্তন মূলত একটি বৈশ্বিক সমস্যা। আবহাওয়া ও জলবায়ুর কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

> পরিবেশ সমস্যা বলতে আমরা এমন কতগুলো সমস্যাকে চিহ্নিত করি সেগুলো প্রকৃতিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির অবক্ষয় ও অবক্ষয়ের ফলে সে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তাকে

> আমরা পরিবেশ সমস্যা বলতে পারি, যেমন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, জীব বৈচিত্র্যের অবলুপ্তি ইত্যাদি। ... পরিবেশ সমস্যার একটি বিশেষত্ব এই যে তা আঞ্চলিক থাকে না, বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিণত হয় [খানম, ২০০৯, পৃ. ২৭]।

আমরা পৃথিবীর দেশগুলোকে ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত করতে পারলে ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অনেকটা কার্যকারণ সম্পর্কের অনুরূপ। অর্থ্যৎ প্রতিটি কাজের পেছনেই একটি কারণ থাকবে। কারণ ব্যতীত কার্য অথবা কার্য ব্যতীত কারণ সম্ভব নয়। ঠিক অনুরূপভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনেও কতিপয় কারণ বিদ্যমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের যে পরিবর্তন হয়তো ২০ অথবা ৩০ বছর পর সংঘটিত হতো সেটি এখন ২০ অথবা ৩০ বছর পূর্বে সংঘটিত হচ্ছে।

জলবায়ু পরির্বতনের কারণ ও প্রভাব

আমাদের পারিপার্শ্বিক সবকিছু মূলত নির্ভরশীলতার একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি, যা কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে সার্বিক পরিবেশে বিপর্যয় নেমে আসে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণকে মূলত ২টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. প্রাকৃতিক এবং ২. মনুষ্য সৃষ্ট।

সমুদ্রতলদেশে সৃষ্ট ভূমিকম্পের কারণে সংঘটিত সুনামী, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট দাবানল, তুষারধস, অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা এসব মূলত প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট জলবায়ুগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত।

পক্ষান্তরে, সভ্যতার নামে বসতি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণের জন্য অবাধে বৃক্ষ নিধন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন ব্যতীত নদীতে ফেলা প্রভৃতি হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট কারণে জলবায়ুগত পরিবর্তনে সহায়ক কারণ। মানুষের এসব কাজের কারণে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে যা সামগ্রিকভাবে জলবায়ুর ওপর প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তন কোনো একক প্রক্রিয়া নয়, একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও সামগ্রিক। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব লক্ষণগুলো দেখা যায় তা-ই মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে বিবেচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় : বৃষ্টিপাত না হওয়া, জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, বৃক্ষনিধনের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়া, মরুকরণের লক্ষণ প্রকট হওয়া, জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাওয়া, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে নদীর পানি দূষণ, ঋতুবৈচিত্র্য কমে আসা, এসিড বৃষ্টি হওয়া, বিভিন্ন জীবপ্রজাতি ধ্বংস হওয়া, অসময়ে বন্যা ও খরা দেখা দেয়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া প্রভৃতিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অপেক্ষা মানব সৃষ্ট কারণ অনেক বেশী দায়ী। প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু পরিবর্তন অনেক ধীর গতিতে হলেও মানব সৃষ্ট কারণে সংঘটিত জলবায়ু পরিবর্তনের গতি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এই বিষয়টিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের " জনসংখ্যা তত্ত্ব " এর সাথে সম্পৃর্ক্ত করে উপস্থাপন করা যায়। ম্যালথাস তাঁর *An Essay on the Principle of Population (1798)* নামক গ্রন্থে বলেন : "প্রাকৃতিকভাবে মানুষের খাদ্য গাণিতিকহারে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬) বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ নিজে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় (১, ২, ৪, ৮, ১৬) যদি না কোনো শক্তিশালী প্রাকৃতিক নিরোধ একে নিবৃত্ত করে।" (www.economicsdiscussion.net/articles/ malthusion-theary-of-population-explained-with-it-critism/1521) [retrieved from 03 April, 2020 at 11:45 A.M.] ঠিক এই বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা মানব কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রার তুলনায় কম হবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু পরিবর্তন গাণিতিক হারে হয় কিন্তু মানব সৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তন দ্রুত জ্যামিতিক হারে হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের কর্মের প্রভাব বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিশ্বের উন্নত দেশের অনেক নামী দামী ব্রান্ডের শিল্পকারখানাগুলো অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে অবস্থিত এবং তার পেছনের কারণ হলো এসকল দেশে পণ্য উৎপাদনের খরচ কম এবং সেই সাথে কারখানাসমূহ হতে নিঃসৃত বর্জ্যপদার্থ এবং কালো ধোঁয়া সেই সকল দেশের পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। নিজেদের স্বার্থ বিবেচনায় উন্নত দেশগুলো পরিবেশ দূষণের বিষয়গুলো কৌশলে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের উপর চাপিয়ে দেয়।

জলবায়ু সংরক্ষণে মানুষের দায়িত্ব

একটি বৈশ্বিক সংকট হিসেবে জলবায়ু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশসমূহকে প্রভাবিত করছে যার ফলস্বরূপ খরা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঋতু বৈচিত্রের পরিবর্তন, বন্যা, অসময়ে বৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। সাধারণ অর্থে দর্শন বলতে জগতের মৌলিক সমস্যাবলীর যৌক্তিক অনুসন্ধানকে বুঝায় আর মৌলিক সমস্যাবলী মূলত ব্যক্তি, জীবন ও জগৎকেন্দ্রিক। আর জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি ব্যক্তি, জগৎ ও জীবন– এই তিনটি ক্ষেত্রের সাথেই সম্পর্কিত। ১৯৭০ এর দশকে দার্শনিকরা পরিবেশগত সমস্যাকে মূলত একটি নৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং বিশ্বের প্রাকৃতিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনের কথা বলেন। বর্তমান সময়ের একটি জনপ্রিয়

স্লোগান, "Think globally, act locally" (Mohammed and Osman, 2015, P.2). অর্থাৎ বৈশ্বিক পর্যায়ে চিন্তা করে আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটি যেহেতু একটি বৈশ্বিক সমস্যা তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে। এ প্রসঙ্গে Goodin ও Pettit সম্পাদিত গ্রন্থে বলা হয়েছে: "পরিবেশবাদ তুলনামূলকভাবে বড় আকারে স্থানীয় পরিবেশবাদ হিসেবে শুরু হয়েছিল" [Goodin and Pettit (ed), 1993, P. 474]। মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তায়। কারণ আমরা বর্তমানে যে পরিবেশ পাচ্ছি তা আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের জন্য কিংবা পরিবেশকে সুস্থ তথা দূষণমুক্ত রাখার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে জলবায়ু সংরক্ষণ করা বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব। বর্তমান প্রজন্মের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত।

জলবায়ু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্বের নৈতিক ভিত্তি মানুষ তার বিবেকের সহায়তায় যেকোনো কাজের নৈতিক মূল্য নিরূপণ করে থাকে। যে কোনো কাজকে কতিপয় মানদণ্ডের সহায়তায় কাজের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত এসব বিচার বিবেচনার মাধ্যমে কাজটির নৈতিক মূল্য নিরূপণ করে থাকে এবং এসব মানদণ্ডের সহায়তায় বিচার বিবেচনার মাধ্যমে কাজটির নৈতিক ভিত্তি বিবেচনা করা হয়ে থাকে। জলবায়ু সংরক্ষণে মানুষের দায়িত্বের নৈতিক ভিত্তির দিকটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(i) উপযোগবাদী বিবেচনার দিক থেকে;

(ii) পরিণতিমুক্ত বিবেচনার দিক থেকে।

(i) উপযোগবাদী বিবেচনার দিক থেকে: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই জীবন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ কমানোর ওপরও গুরুত্ব আরোপ করে বিধায় উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু সংরক্ষণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণ আনয়নের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব। একটি নৈতিক মতবাদ হিসেবে উপযোগবাদ মানুষের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক সুখকে প্রাধান্য দিয়েছে। উপযোগবাদী নীতিদার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে: "The greatest Happiness to the greatest number" অর্থাৎ যে কাজ সর্বাধিক লোকের সুখ উৎপাদন করে সেই কাজ ভাল, আর সে কাজ তা করে না, সে কাজ মন্দ। মিলের এই নীতিটির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে জলবায়ু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্বের দিকটিকে আমরা ভালো বলতে পারি। কারণ তা সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সুখ আনয়ন করতে পারবে। এই নীতির আলোকে জলবায়ু সংরক্ষণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক কোন বিষয় না হলেও নৈতিক কর্তব্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তাই অনবায়নযোগ্য সম্পদ

ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধির দিকটি ভালো কেননা তা শুধু আমাদেরই না বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও সুখ আনয়ন করবে।

জলবায়ু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণ আনয়নের ক্ষেত্রে উপযোগবাদী মতবাদটি সামঞ্জ্যপূর্ণ হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই মতবাদটি অসামজঞ্জস্যপূণ। *Philosophy: The Basics* গ্রন্থে উপযোগবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "উপযোগবাদ হল নৈতিক তত্ত্বের ফলাফলের সর্বোত্তম প্রকার" [Warburton, 2003, P. 48]। উপযোগবাদ মূলত সুখবাদ থেকে অনুসৃত হয়েছে। এই মতবাদ সুখকে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করে। কিন্তু উপযোগবাদী ধারণাটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ মানুষই কেবল প্রাণীজগতের একমাত্র সদস্য নয়। উপযোগবাদী ধারণাটি জলবায়ুর ক্ষেত্রে প্রণীত হলে মানুষ নির্বিচারে পরিবেশ ধ্বংস করতে পিছপা হবে না। এমনকি কোন নিয়মের শৃঙ্খলই তাকে বিরত করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান পরিবেশবিদ Aldo Leopold এর 'The Land Ethic' (Scherer, Donald and Attig, Thomas (eds.), 1983, p. 06) প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। লিওপোল্ড তাঁর এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেন মানুষ, পশু-পাখি ও গাছপালা মিলে যে জীবগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রাণীজগতের সদস্য হিসেবে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করলেই চলবে না সেই সাথে মানুষের পরিবেশ ও জলবায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি উপাদানের স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে, তাই উপযোগবাদী নীতিটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড এর বক্তব্য হলোঃ "একটি জিনিস সঠিক যখন এটি জৈবিক সম্প্রদায়ের অখণ্ডতা, স্থিতিশীলতা এবং সৌন্দর্য সংরক্ষণ করে, তবে এর ব্যত্যয় ঘটালে এটি ভুল" [Scherer and Attig (eds); 1983; P:08]। লিওপোল্ড তাঁর এই বক্তব্যের জৈবিক সম্প্রদায় (Biotic Community) বলতে মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানকে বুঝিয়েছেন।

অগ্রাধিকারমূলক উদারনৈতিক সুসংহত উপযোগবাদ উত্থাপনকারী নীতিদার্শনিক পিটার সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি' নামক একটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই নীতিটির মর্মার্থ হচ্ছেঃ আমরা আমাদের নৈতিক বিচার বিবেচনায় যেমন নিজেদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেই, তেমনি সকলের স্বার্থের প্রতিও সমগুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তাঁর ভাষায়ঃ "একটি স্বার্থ, তা সেটি যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ হতে পারে" [Singer, 2001, p. 20]। পিটার সিঙ্গারের এই নীতিটি জলবায়ু সংরক্ষণের ওপর প্রয়োগ করলে দেখা যাবে বর্তমানে আমরা যেমন নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করে অবাধে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করছি এর ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কাজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে

তাই ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে তাদের স্বার্থের প্রতি সমগুরুত্ব প্রদান করে আমাদের জলবায়ু সংরক্ষণে সচেতন হতে হবে।

(ii) পরিণতিমুক্ত বিবেচনার দিক থেকে: পরিণতিমুক্ত বা কর্তব্যবিষয়ক মতবাদ অনুসারে কাজের ফলাফলের উপর নয় বরং কাজটির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার উপর নির্ভর করে কাজটির নৈতিক মূল্য নিরূপণ করা হয়। কর্তব্যবিষয়ক মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনার প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ইমানুয়েল কান্ট ও জন রলসের মতবাদের আলোকে জলবায়ু সংরক্ষণের বিষয়টি আলোচনা করা হল।

কান্টের দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন : ইমানুয়েল কান্টের নীতিবিদ্যায় 'সদিচ্ছা' সম্পর্কিত ধারণা, 'কর্তব্যের জন্যে কর্তব্য নীতি' এবং 'শর্তহীন আদেশ' কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান দখল করে আছে। সদিচ্ছা সম্পর্কে কান্ট বলেন, "একমাত্র সদিচ্ছা (good will) ছাড়া পৃথিবীর অথবা পৃথিবীর বাইরে কোনো কিছুকে বিনাশর্তে সৎ (ভাল) বলা যায় না " (কান্ট,১৯৮২ পৃ.৪৯)। সদিচ্ছা সম্বন্ধে কান্ট মনে করেন যে, এমন কোন গুণ নেই যা সদিচ্ছার সাথে যুক্ত হয়ে পরিণতিতে মন্দ কিছু সৃষ্টি করতে পারে। এই বিষয়টি জলবায়ুর ক্ষেত্রে যদি প্রয়োগ করা যায় তবে বিষয়টি দাঁড়াবে জলবায়ু পরিবর্তন না করার সদিচ্ছা অর্থাৎ নিজেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা জলবায়ুর স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট না করা। সদিচ্ছা কাজের নৈতিক আচরণ ও মূল্যায়ণের সাথে জড়িত। সদিচ্ছা প্রসূত আচরণ ও কাজকে কান্ট নৈতিক ও ভাল বলে মূল্যায়ন করেন [খানম, ২০০২, পৃঃ ৩০]। তাই জলবায়ু পরিবর্তন না করার বিষয়টি যখন সদিচ্ছাপ্রসূতভাবে উদ্ভূত হবে তখন তা নৈতিক ও ভাল বলে মূল্যায়িত হবে।

কর্তব্য সমন্ধে কান্ট তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য তিনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথমত, কোনো কাজের নৈতিক মূল্য থাকার জন্য কাজটি কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হতে হবে [খানম, ২০০২, পৃঃ ১৩]। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকাকে 'নৈতিক মূল্য' হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য কাজটি মানুষের কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হতে হবে অর্থাৎ পরিবেশের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব রয়েছে তা থেকেই মূলত এই কর্তব্যবোধের উদ্ভব ঘটতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কর্তব্যবোধ সম্পর্কিত কাজের নৈতিক মূল্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কাজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নয় বরং কাজের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কান্টের নীতিটি সম্পূর্ণভাবে পরিণতিমুক্ত নীতি অর্থাৎ কর্তব্য বা নীতির প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শনই নৈতিক মর্যাদা লাভের মুখ্য দিক। বিষয়টি মানুষের জলবায়ু পরিবর্তন না করার ক্ষেত্রে তখনই নৈতিক মর্যাদা লাভ করতে পারে যখন তা নিষ্ঠা প্রদর্শন থেকে করে থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলতে পারি, মানুষ যেমন জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি পরিবেশ থেকে বিভিন্ন সুযোগ

সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। সেই দিক থেকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জলবায়ুর প্রতি তার কর্তব্য রয়েছে। নিষ্ঠা প্রদর্শন হিসেবে এই কর্তব্য যখন মানুষ করে থাকে তখনই তা নৈতিক মর্যাদা হিসেবে বিবেচিত হবে। জলবায়ু সংরক্ষণের বিষয়টির ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্ব এড়ানো কান্টের নৈতিক বিধানের পরিপন্থি।

শর্তহীন আদেশ হচ্ছে কান্টের দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি হচ্ছে এমন একটি আদেশ যা ব্যক্তির জন্য অবশ্য পালনীয়, এটি তিনটি সূত্রের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথমসূত্র অনুসারে, এমনভাবে কাজ করো যেন তোমার কাজের মূল সূত্রটা একটি সার্বজনীন নিয়ম হতে পারে বলে ইচ্ছা করতে পারো [খানম, ২০০৯, পৃ: ৩৮]। এই সূত্রটি মানুষকে বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা হিসেবে গণ্য করে এবং সকল মানুষের জন্য অবশ্যই নৈতিক আইনের অত্যাবশকীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে নৈতিক আইন সকল মানুষের জন্য অত্যাবশকীয় হবে।

দ্বিতীয় সূত্রঃ "এমনভাবে কাজ করো তা তোমার নিজের ক্ষেত্রেই হোক আর অন্য কারো ক্ষেত্রে হোক যেন মনুষ্যত্বকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, শুধু উপায় হিসেবে কখনো নয় [খানম, ২০০৯, পৃ: ৩৯]। দ্বিতীয় সূত্রের মূল বক্তব্য হলো মানুষের মর্যাদা। এই নিয়মটি পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রণীত হলে বিষয়টি দাঁড়াবে পরিবেশকে কখনোই শুধু উপায় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, পরিবেশকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ মানুষ কেবলমাত্র তার ভোগবিলাসের উপায় হিসেবে পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারবে না।

তৃতীয় সূত্রঃ সার্বজনীন আইন প্রণয়নকারী ইচ্ছা হিসেবে প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তার ইচ্ছার ধারণা [খানম; ২০০৯; পৃ: ৪০]। এই সূত্রের মূল বক্তব্য হলো নৈতিক নিয়ম স্ব-আরোপিত নিয়ম। তাই পরিবেশ ও জলবায়ুর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রণীত নিয়ম হতে হবে স্ব-আরোপিত নিয়ম কারণ তাহলে ব্যক্তি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে।

আমরা জানি কাজের নৈতিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে দর্শনে দুইটি বিপরীত মতবাদ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কান্ট এর পরিণতি মুক্ত নীতির আলোকে মানুষের কাজের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে পরিবেশের দূষণ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষ তার প্রভুত্ব বিস্তারের মাধ্যমে জলবায়ু এবং পরিবেশ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। তাই উদ্দেশ্যপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রতি মানুষের কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমরা যেন পরিবেশ ও জলবায়ুকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিষয়টি বিবেচনায় রাখি। কাজের মুল্যায়ণের ক্ষেত্রে কান্টের মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর

সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবাদী দিকটি প্রাধান্য পাওয়া উচিত বলে প্রতীয়মান হয়।

রলসের নীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন: জন রলস *A Theory of Justice (1971)* নামক গ্রন্থে একটি তত্ত্ব প্রদান করেন যা দুটি নীতির সমন্বয়ে গঠিত।

> প্রথম নীতি, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই অন্যান্য মানুষের অনুরূপ পর্যাপ্ত সমান স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থাকবে। দ্বিতীয় নীতি, সামাজিক ও আর্থিক দ্রব্যসমূহ বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি তা (১) সকল মানুষের সমান সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করেন এবং (২) মর্যাদাপূর্ণ পদ ও চাকরি লাভের সমান সুযোগ প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে পারে [খালেক, ২০১০, পৃ. ৪২]।

প্রথমটিকে বলা হয় 'স্বাধীনতার নীতি' এবং দ্বিতীয়টিকে 'বিভেদের নীতি' বলা হয়। রলসের এই নীতিটি যদি পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তবে বিষয়টি সমতার নীতির ক্ষেত্রে দাঁড়ায় পরিবেশের উপর উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সমান অধিকার। অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের ওপর প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার আছে। এই প্রসঙ্গে *Practical Ethics* গ্রন্থে বলা হয়েছে:

> ...রুয়ান্ডার রাষ্ট্রপতি পল কাগামে বলেন তিনি নতুন কোনো 'দোষারোপ খেলা' (blame game) খেলতে চান না। তাঁর মতে, এই খেলা যে শুধু নিম্ন রুচিসম্পন্ন খেলা হবে তাই নয় এটি একটি বিরুদ্ধ ফলদায়ক খেলাও হবে। এর পরিবর্তে তিনি প্রস্তাব করেন যে, প্রতিটি মানবসত্তা বায়ুমণ্ডলে সম অংশীদারিত্বের অধিকারী [Singer, 2011, P. 224]।

আবার রলসের দ্বিতীয় নীতিটি যদি পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তবে বিষয়টি এরূপ দাঁড়াবে যে, যদি অধিকতর মন্দ অবস্থায় নিপতিত দেশগুলোর জন্য অধিকতর সম্পদ ব্যয় করা যায়, তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে। ন্যায় বিচার আমাদের এরূপ কাজ করতে নির্দেশ করে। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলো তাদের ভোগবিলাসের জন্য অধিক পরিবেশ দূষণ করেছে কিন্তু এখন সময় এসেছে উন্নত দেশগুলোর ভোগবিলাসের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

জলবায়ু সংরক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণতা: মানুষ তার প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে যার সার্বিক ফলাফল পড়ছে জলবায়ুর ওপর। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে 'পরিবেশ ন্যায়পরতা' (environmental justice) এবং 'বৈশ্বিক নীতি' (global policy) গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। পরিবেশ ন্যায়পরতা সম্পর্কে বলা হয়েছে: "পরিবেশগত ন্যায়বিচার হলো উন্নয়ন বাস্তবায়ন এবং পরিবেশগত সুবিধার সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান সুরক্ষা এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ" [Common wealth of

Massachusetts, 2002, P. 02]। সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণে পরিবেশ ন্যায়পরতার দুটি দিক পাওয়া যায়। সংজ্ঞাটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং সুবিধা ও বোঝাগুলো বণ্টন করে নেয়া- পরিবেশ ন্যায়পরতার এই দুটি দিকের ওপর ভিত্তি করেই মূলত "বৈশ্বিক নীতি"র আর্বিভাব। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "পরিশেষে জলবায়ু নীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচন নির্ভর করে কত দ্রুত বা কোন স্তরে আমরা বিশ্ব উষ্ণায়ন বন্ধ করতে চাই তার উপর" [Archer and Rahmstorf, 2012, p. 224]। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে:

> আইপিসিসির প্রতিবেদনগুলি নীতিনির্ধারক এবং সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পটভূমি তথ্য প্রদান করে যাতে তারা কোন নীতি অনুসরণ করতে চান সে সম্পর্কে সুপরিচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে... কারণ জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব সমাজের উপর এর প্রভাব এমন একটি বিষয় যা আমরা প্রায় প্রতিদিনই ভাবি [Archer and Rahmstorf, 2012, pp. 221-222]।

দূষণের ক্ষেত্রে প্রায়ই একটি ঐতিহাসিক নীতি প্রয়োগ করা হয়। 'তুমি এটি ভেঙেছ, তুমি এটি জোড়া লাগাও'– এই নীতিটি 'দূষণকারীর ক্ষতিপূরণ' (The polluter paye) নামেও পরিচিত [Singer, 2011, p. 220]। যদি একটি রাসায়নিক কারখানা কোনো একটি নদীর পানি দূষণ করে, তাহলে ঐ নদীর পানি পরিষ্কার করার দায়িত্ব ঐ কারখানা মালিকের। আমরা যদি এই নীতিটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে বিষয়টি দাঁড়াবে একটি দেশ যেই সমস্যা সৃষ্টির জন্য যতটুকু দায়ী, সেই দেশকে সমস্যা সমাধানে ঠিক ততটুকু পরিমাণ দায়িত্ব বহন করতে হবে।

পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা থেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার উদ্ভব

১৯৬২ সনে র‍্যাচেল কারসন (Rachel Carson) ডিডিটির বিষক্রিয়া সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন– *Silent Spring* শিরোনামে [খানম, ২০০৯, পৃ. ২৮]। বইটির বিষয়বস্তু ছিলো কীটনাশক জাতীয় রাসায়নিক ঔষধগুলো কিভাবে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষসহ সমস্ত প্রাণী জগতকে বিষাক্ত করছে তা তুলে ধরা। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা মূলত চক্রাকারে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ প্রথমে মানুষ তার কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিবেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় এবং এর প্রেক্ষিতে পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে তা ঐ এলাকার আবহাওয়ার ওপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সার্বিকভাবে ঐ অঞ্চলের জলবায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো (বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা, বারিপাত প্রভৃতি) মূলত একই। ধীরে ধীরে গলে যাওয়া এক খণ্ড বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি সাদা ভাল্লুক বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানের একটি বিশেষ প্রতীকরূপে গণ্য হচ্ছে। কারণ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলস্বরূপ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বরফ গলে যাচ্ছে। ১৯৯৫ থেকে ২০০৬ সাল পৃথিবীর জন্য উষ্ণতম সময় হিসেবে বিবেচিত হয়।

জলবায়ুগত দিক প্রতিটি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে

জলবায়ুগত দিকটি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে সমাজকে, সমাজের সংস্কৃতি, কার্যক্রম এবং এরই ধারাবাহিকতায় একটি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করে থাকে। এই দিকটির ওপর হান্টিংটন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

> *Civilization and Climate* গ্রন্থে হ্যান্টিংটন বলেন যে, মানব সভ্যতার বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে জলবায়ুর গভীর প্রভাব রয়েছে; প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও এর ব্যবহার নিঃসন্দেহে সভ্যতার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ...মতানুসারে সভ্যতার উত্থান ও পতন উভয়ই ঘটে জলবায়ুর গভীর প্রভাব থেকে। তাঁর মতে বিখ্যাত সভ্যতা যেমন মিশরীয়, সুমেরীয়, গ্রীক বা রোমান সভ্যতা-সবগুলো সভ্যতাই অনুকূল জলবায়ুর জন্য গড়ে উঠেছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে প্রতিকূল জলবায়ুগত পরিবর্তন ঘটাতে ঐ সব সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী দুটি প্রাচ্য সভ্যতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। নগরী দুটি পরিবেশের অনুকূলে গড়ে উঠেছিলো। ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহারের ফলে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আলোকিত হয়েছিল কিন্তু ভূগর্ভস্থ পানি নিঃশেষের কারণে প্রতিকূল পরিবেশে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী দুটিই একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। ইতিহাসের এ নির্দশন প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানব সংস্কৃতির নিয়ন্তা বলে প্রমাণ করে [খানম, ২০০৯ পৃ. ৩৭]।

জলবায়ু প্রতিটি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে। মানুষের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বসতি, কাজের ধরণ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জলবায়ুগত অবস্থার প্রভাব বিদ্যমান। পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে জলবায়ুগত প্রভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় শীত প্রধান দেশে মানুষ উষ্ণ কাপড় পরিধান করে আবার আর্দ্র অঞ্চলে ঢিলেঢালা ও হালকা কাপড় পরিধান করে থাকে। আবার শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ করে থাকে পক্ষান্তরে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের শস্য জাতীয় খাবার বেশি প্রচলিত।

পরিবেশগত সংকটের একটি কারণ প্রজাতি বিলুপ্তি

বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশগত সংকটের একটি অন্যতম সূচক হলো প্রজাতি বিলুপ্তি। জীববিদদের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পৃথিবীতে বছরে চার থেকে ছয় হাজার প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে।

> ...মানুষের কার্যকলাপ থেকে স্বাধীনভাবে প্রজাতির বিলুপ্তির হার প্রায় প্রতি কয়েক বছরে একটি প্রজাতি, তিনি অনুমান করেন যে, প্রতি বছর চার থেকে ছয় হাজার প্রজাতি এখন

> বিলুপ্ত হচ্ছে। মানুষের উপস্থিতিতে প্রতিদিন দশটিরও বেশি প্রজাতি বিলুপ্তি ঘটে এবং প্রজাতি বিলুপ্তির এই হার সাধারণ হারের চেয়ে দশহাজার গুণ বেশি [Jardins, 2011, p. 90-91]।

অর্থাৎ মানুষের কর্মকাণ্ড ছাড়া, কেবল প্রাকৃতিক কারণে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বর্তমানে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে জীবমণ্ডলে প্রজাতি বিলুপ্তির হার দশ হাজার গুণেরও বেশি। জলবায়ু সংরক্ষণ করতে হলে আমাদের প্রথমেই পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বকে একটি অখণ্ড একক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

> জারডিন্স তাঁর *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy* গ্রন্থে বলেন যে, পরিবেশের সমস্যাগুলো একটি মৌলিক প্রশ্নের উপর দৃষ্টি রেখেছে আর সেটি হলো– আমাদের জীবনব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? এমন প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় যে পরিবেশ সমস্যা নিছক কোন প্রযুক্তি বা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সমস্যা নয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের নৈতিক চেতনার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হবে। এটা হচ্ছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি [খানম, ২০০৯, পৃ. ২৮]।

প্রজাতি বিলুপ্তির বিষয়টি প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণ, নৈতিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ অনেক দার্শনিকদের মতে, অন্য প্রাণীদের প্রতি মানুষ নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল হলেও বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটানোর ফলে পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট প্রাণী/উদ্ভিদ প্রজাতি চিরতরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াকেই প্রজাতির বিলুপ্তি বলা হয়। এটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হলেও মানবসৃষ্ট কারণ প্রজাতি বিলুপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো একটি প্রজাতির বিলুপ্তি পরিবেশের উপাদানসমূহের মধ্যে বিদ্যমান ভারসাম্য নষ্ট করে পরিবেশগত সংকটের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একুরিয়ামে পালনের জন্য বিদেশি সাকার মাছ আমাদের দেশে আনা হলে তা দেশের নদী-নালায় ছড়িয়ে পরে যা দেশীয় মাছের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং দেশীয় অনেক মাছ এখন একারণে প্রায় বিপন্নের পথে। আবার পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনে বন ধ্বংস, জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রভৃতি কারণে বাঘ এবং অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল সংকুচিত হচ্ছে। আবার নদী দূষণ, নৌযান (ইঞ্জিনচালিত) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গাঙ্গেয় ডলফিনের (শুশুক) সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

পরিবেশের ওপর মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপ প্রজাতির বিলুপ্তির মাধ্যমে পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি করে। এছাড়া প্রকৃতির প্রতি মানুষের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (anthropocentrism), যা মানুষের প্রয়োজন ও স্বার্থকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং

সেই সাথে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের অন্যান্য প্রজাতির ওপর মানুষের শোষণকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। যা কিনা প্রজাতি বিলুপ্তি এবং পরিবেশগত সংকটের অন্যতম একটি কারণ।

নৈতিক ভিত্তি কি ও কেন

নৈতিকতা মানুষের কর্তব্যকে নির্দেশ করে। বস্তুত নৈতিকতা হচ্ছে ঐ সকল অবধারণ, মানদণ্ড ও আচরণ যাচাইয়ের নিয়মাবলী যেগুলোর যৌক্তিকতা আমরা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করতে পারি। পরিবেশ সঙ্কট ও তা নিরসনের জন্য লিওপোল্ড নতুন মূল্যের কথা বলেন। এই নৈতিক মূল্য হচ্ছে 'দার্শনিক মূল্য' বা 'নৈতিক মূল্য'। তিনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে পরিবেশকে আমরা অর্থনৈতিক মূল্যের দৃষ্টিতে না দেখে বরং নৈতিক দৃষ্টিতে দেখব। তাঁর এই নতুন নৈতিক মূল্য "ভূমি নীতিবিদ্যা" নামে খ্যাত [খানম, ২০০৯, পৃ. ১১৭-১১৮]। ভূমির প্রতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে প্রকৃতির সাথে নৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেয়, যেখানে মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড বলেন: "ভূমির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, প্রশংসা এবং এর মূল্যের প্রতি উচ্চ শ্রদ্ধা ছাড়া ভূমির সাথে একটি নৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে, এটা আমার কাছে অবোধ্য। মূল্য বলতে আমি অবশ্যই অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে বৃহত্তর কিছু বোঝাতে চাইছি; আমি দার্শনিক অর্থে মূল্য বলতে চাইছি" [Scherer and Attig (eds), 1983, p. 07]। Leopold-ই সর্বপ্রথম পরিবেশগত সমস্যাকে তাঁর "The Land Ethic" প্রবন্ধে নৈতিক তথা দার্শনিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

> জন পাসমোর ১৯৭৪ সনে *Men's Responsibility for Nature* গ্রন্থে প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন যে, প্রকৃতির সত্তাগুলোকে যখন আমরা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে যাই তখন নৈতিকতার ভিত্তি বা বিবেচনা একটি মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। কোন সত্তার স্বতঃমূল্য গুণ থাকার দিকটি ধর্মীয় বিবেচনায় নয়, নৈতিকতার বিবেচনায় গুরুত্ব লাভ করে। যেমন, প্রাণী সত্তা সংবেদনশীল কি-না, প্রাণী সত্তার ব্যথা বা যন্ত্রণার অনুভূতি আছে কি-না এ বিষয়টি নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে বিচার করার দাবি রাখে। তিনি বলেন যে, প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক নৈতিক বিবেচনার অধীনে থাকা উচিত, মানবিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনকিছুর সাথে নৈতিক বিবেচনাকে একত্রিত করে দেখা উচিত নয় [খানম, ২০০৯, পৃ. ১১৮]।

আধুনিক মানুষের মৌলিক বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট জীবনযাত্রার কারণেই পরিবেশের অবনতি ঘটেছে। প্রকৃতি যেভাবে কাজ করে, আর মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কে যেভাব চিন্তা করে, এ দুয়ের পার্থক্য থেকেই পৃথিবীর মূল সমস্যাসমূহের সৃষ্টি।

নৈতিক নীতিসমূহের পর্যালোচনা

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য গ্রীনহাউজ গ্যাস সমূহ। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ "অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস মিথেন (CH_4), ক্লোরটোলুরন (Treons) এবং নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) এর জলবায়ুর বিস্ফোরণের ফলে মানুষের উপর প্রভাব ১৯৭০-এর দশকে আবিষ্কৃত হয়েছিল" [Archer and Rahmstorf, 2012, p. 12]। জলবায়ু পরিবর্তনের মানুষের ভূমিকার নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

> কেউ কেউ এরূপ আপত্তি করেন যে, শিল্পবিপ্লবের ফলে শুধু শিল্পায়িত জাতিসমূহেরই উপকার সাধিত হয়নি, সমগ্র বিশ্বেরই উন্নতি সাধিত হয়েছে। সুতরাং শিল্পায়িত জাতিগুলোকে দায়ী করা উচিত হবে না। এ কথা সত্য যে, শিল্পবিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন সম্ভব করে তুলেছে, এবং এই উন্নতি সমগ্র বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের উপকার করেছে, এখনো করে যাচ্ছে, কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে এর ফলে শিল্পায়িত জাতিগুলো পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকে উপনিবেশে পরিণত করেছে, এমনকি উপনিবেশ যুগের পরও তারা বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে যার ফলে শিল্পায়িত দেশগুলোতে বসবাসকারী জনগণই বেশি উপকৃত হচ্ছে। ...অন্য আপত্তিটি হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে শিল্পায়িত সেসব জাতি গ্যাস নিঃসরণে জন্য দায়ী, তার দীর্ঘকাল ধরে জানতোই না যে, এই নিঃসারিত গ্যাস ক্ষতিকর হবে। একথা সত্য, তবে ১৮৯৬ সালে প্রথম দিকে স্যাভানটি আরহেনিয়াস (Savante Arrhenius) নামক একজন বিজ্ঞানী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হবে এবং এই গ্যাস গ্রহকে উত্তপ্ত করবে [Singer, 2011, p. 221-222]।

এক্ষেত্রে আরেকটি আপত্তি হিসেবে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ন্যায়বিচারের উপর সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ হচ্ছে জন রলসের *A Theory of Justice* যেখানে তিনি যুক্তি প্রদান করেন যে, যদি অধিকতর মন্দ অবস্থায় নিপাতিত দেশগুলোর জন্য অধিকতর সম্পদ ব্যয় করা যায়, তাহলে তাদের অবস্থায় উন্নতি হবে। ন্যায়বিচার আমাদের এরূপ কাজ করতে নির্দেশ করে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড ন্যাশন্সস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ- এর একটি অনুবিধি দ্বারা অধিকতর মন্দ অবস্থায় নিপাতিত দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়নের অধিকার আছে এবং থাকা উচিত বলে দাবি করা হয়। এখানে দরিদ্র দেশগুলো উন্নয়নের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়, কিন্তু উন্নয়নের অধিকারটি টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্মেলনের ভাষায়, বিশ্বের দেশগুলোর সাধারণ কিন্তু পৃথক দায়িত্ব রয়েছে। দেশগুলোর সাধারণ কিন্তু পৃথক দায়িত্ব রয়েছে। "১৯৯৩ সালে দার্শনিক হেনরি শু (Henry Shoe) যুক্তি প্রদান

করেন যে, গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরনের জন্য আনুপাতিক অংশের (quota) যথার্থ বরাদ্দ 'অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য গ্যাস নিঃসরণ এবং বিলাসিতার জন্য গ্যাস নিঃসরণ এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে" [Singer, 2011, p. 228]। অর্থাৎ কোনো জাতি তাদের বিলাসিতার জন্য বেশি বেশি গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ করবে আর কোনো জাতি তাদের জীবনধারণ করার জন্য কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে এই বিষয়টি অযৌক্তিক কারণ বিলাসিতার জন্য বড় বড় গাড়ি না চালালেও ব্যক্তি জীবন ধারণ করতে পারবে কিন্তু ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা হিসেবে জীবনধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য এবং এই খাদ্য প্রস্তুতের সময় জ্বালানী থেকে নিঃসৃত গ্যাস এবং বিলাসিতার উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উন্নত দেশগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে আসছে। আমাদের ধরিত্রীর অতি উষ্ণায়ন এবং বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত তারাই দায়ী। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর বৈশ্বিক উষ্ণায়নে তেমন কোনো ভূমিকা না থাকলেও আমরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছি। অপর একটি প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায়, কিছু ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

> স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোন ব্যক্তি নৈতিক নিয়ম-কানুন মেনে চললেও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, যেমন- যুদ্ধকালীন অবস্থায় তার পরিবেশবান্ধব নৈতিক মূল্যবোধ বদলে যেতে পারে। বিশেষ করে যুদ্ধরত জাতি স্বদেশে পরিবেশবান্ধব আচরণে অভ্যস্ত হলেও শত্রু দেশে পরিবেশ পরিপন্থি সহিংস আচরণ করতে বিব্রত বোধ করে না। ভারত, জাপান, কোরিয়া, গাজা প্রভৃতি দেশের উদারহণ এখানে দেয়া যায়। অহিংস ধর্মীয় চেতনা অথবা অহিংস নৈতিক মতাদর্শের অবলম্বনকারী হওয়া সত্ত্বেও শত্রু কবলিত যুদ্ধকালীন সঙ্কটের সময়ে মতাদর্শে পারি না যে নৈতিক মূল্যবোধ ও পরিবেশ পরিচর্যার মাঝে সম্পর্কটা অনিবার্য সম্পর্ক [খানম, ২০০৯, পৃ. ১২১-১২২]।

বর্তমানে গাজার বিষয়টি এ বিষয়ে আমরা উল্লেখ করতে পারি। যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য ব্যবহৃত যুদ্ধ সরঞ্জামের থেকে যে দূষণ হয় তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরে নেয়া যায়। জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য যদি কোনো 'নৈতিক নীতি' প্রণয়ন করা হয় তবে তা হতে হবে সর্বজনীন এবং সহিষ্ণুতা (toleration) ও নিরপেক্ষতা (Neutrality)-র আলোকে প্রণীত, তাহলে সেই নীতিতে কোনো বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীকে কোনোরূপ বিশেষ ছাড় বা সুবিধা দেয়া হবে না।

উপসংহার

অতএব বলা যায় যে, আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ এবং কর্তব্য সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণেই নৈতিকতার ধারণাগুলোর মধ্যে মতানৈক্য ঘটে থাকে। কান্ট তাঁর নীতিবিদ্যায় কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য সম্পাদনের কথা বলেন কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে বিলাসিতার দিকটি কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয় না।

প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য, ভোগবাদী মানসিকতা এবং স্বার্থপরতার ফলই আজ পৃথিবীকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার নীতি হতে হবে সর্বজনীন এবং এক্ষেত্রে নৈতিকতার চর্চার বিষয়টি হতে হবে আপেক্ষিক থেকে সর্বজনীন পর্যায়ের। কারণ নৈতিকতার প্রশ্নে আমরা শুধু নিজেদের জন্য নই, ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্যও দায়বদ্ধ। যা এক প্রকারের আন্তঃপ্রজন্ম নৈতিকতা। জীবনের মূল ভিত্তি হলো প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান। মানুষের ভোগবাদী মনোভাবের পরিবর্তন করে প্রকৃতির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ পরিবেশ তথা প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতা মূলত জীবনের প্রতি উদাসীনতার নামান্তর। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক কেবল ভোগের নয়, বরং দায়িত্বশীলতার। ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ভারসাম্য রক্ষার্থে টেকসই নীতিতে মনোযোগী হতে হবে এবং ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে হবে যেন পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন সেখানে অগ্রাধিকার পায়। পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে প্রকৃতির অংশীদার এবং সংরক্ষক হিসেবে মানুষকে গড়ে উঠতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

করিম, সরদার ফজলুল। ২০০৬। *দর্শনকোষ*, ঢাকা : প্যাপিরাস প্রকাশনী।

কান্ট। ১৯৮২। নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি (সাইয়েদ আবদুল হাই, অনূদিত)। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

খানম, রাশিদা আক্তার। ২০০৯। *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*। ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

খানম, রাশিদা আক্তার। ২০০৯। *নীতিবিদ্যা : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

An Essay on the Principle of Population (1798) (www.economicsdiscussion.net/articles/malthusion-theary-of-population-explained-with-it-critism/1521) [Retrieved from 03 April 2020 at 11:45 A.M]

খালেক, এ. এস. এম. আবদুল। ২০১০। *সামাজিক ন্যায়বিচার ও জন রলস*। ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস।

Archer, David and Rahmstorf, Steafan. (2012). *The Climate Crisis : An Introductory Guide to Climate Change*. New York : Cambridge University Press.

Commonwealth of Massachusetts. (2002). *Environmental Justice Policy*. Mass : Massachusetts State House.

Goodin, R.E and Pettit, P. (ed.). (1993). *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. Oxford : Black well publishers.

Jardins, J.R.D. (2001). *Environmental Ethics* (3rd Edition). London : Woodworth Publishing Company.

Mohammed, I. and Osman, B. (2015). A Critical Evaluation of "Think Globally, Act. Locally" and "Think Locally, Act Globally" in the Context of Sustainable Development. https://www.researchgate.net/publication /289125506

Scherer, Donald and Attig, Thomas (eds.). (1983). *Ethics and the Environment*, New Jersey : Prentice Hall Inc.

Singer, Peter. (2011). *Practical Ethics* (3rd ed). Cambridge: Cambridge University Press. অনুবাদ : রায়, প্রদীপ কুমার। ২০১২। *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* (৩য় সংস্করণ)। ঢাকা : অবসর।

Taylor, Paul W.. (2011). *Respect for Nature : A Theory of Environmental Ethics* (25th Anniversary edition). New Jersey : Princeton University Press.

Warburton, N.. 2003. *Philosophy : The Basics*. London : Routledge.